তুলি-কলম

কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর ভক্তিগীতি

শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) নামটি শুনলে প্রথম যে-শব্দ মনে জাগে তা হল 'বিদ্রোহী'। তাঁর ওজস্বী কলমের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন 'কারার ঐ লৌহকপাট' ভেঙে ফেলতে। বারবার কারাবাস করা সত্ত্বেও এই নির্ভীক কবির লেখনী সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক শোষণের তীব্র বিরোধিতা থেকে কখনও বিরত থাকেনি। তবে এই নিবন্ধে আমরা বিদ্রোহী নজরুলের এমন একটি দিক আলোচনা করতে চলেছি যার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। সেটি হল তাঁর রচিত ভক্তিগীতি বিশেষত শ্যামাসংগীতের সুবিপুল ভাণ্ডার। কিন্তু এ-বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার।

১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমদ একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। মার নাম ছিল জুবেদা খাতুন। ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি দরগার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ গ্রহণ করেন ও মসজিদের মুয়েজ্জিন হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। শৈশবে ইসলাম শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

কিছুদিন পর তিনি তাঁর কাকার লেটো দলে সামিল হন। এই সময়ই তাঁর কাব্যপ্রতিভা স্ফুরণের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। দ্রুত গান রচনা করার ক্ষমতা এইসময় তিনি আয়ত্ত করেন। লেটো দলের অভিজ্ঞতাই তাঁকে হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করায়। এইসময় কিশোর নজরুল এই গানের দলের জন্য অনেক যাত্রাপালা রচনা করেন যথা 'শকুনিবধ', 'দাতা কর্ণ', কবি কালিদাস', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদি।

কয়েক বছর লেটো দলে থাকার পর নজরুল আবার স্কুলে পড়তে শুরু করেন, কিন্তু কিছুকাল পর অর্থ উপার্জনের তাড়নায় স্কুল ছেড়ে একটি কবিয়াল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। এদের সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি রেলের গার্ডের রাঁধুনির কাজ করেন ও পরবর্তী কালে আসানসোলে এক চায়ের দোকানে কাজ করেন। এইভাবে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই আমরা তাঁর ছেলেবেলা অতিবাহিত হতে দেখি।

অতঃপর নজরুল গ্রামে ফিরে আসেন। আবার স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি দশম শ্রেণি অবধি পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েই তিনি ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসাবে যোগ দেন। করাচি

ক্যান্টনমেন্টে তাঁর সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' ও প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেন।

১৯২১ সালে তিনি প্রমিলা দেবীকে বিবাহ করেন। হিন্দু স্ত্রীর ধর্মান্তরণের কোনও দাবি না রেখে ধার্মিক সহিষ্ণুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি। তাঁর সন্তানদের নামে হিন্দু ও মুসলিম উভয় নামেরই সংমিশ্রণ লক্ষণীয়—কৃষ্ণ মোহম্মদ, অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

১৯১৯ থেকে ১৯৪২—তেইশ বছরের এই নাতিদীর্ঘ সময়ে কাজী নজরুল তিন হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ভক্তিগীতির মধ্যে ইসলাম ভক্তিগীতি ও হিন্দু ভক্তিগীতি উভয়ই রয়েছে, তবে হিন্দু ভক্তিগীতিই অধিক সংখ্যক (৫২৫টি)। এর মধ্যে রয়েছে ভজন, শ্যামাসংগীত, আগমনী, কীর্তন, শিব-চণ্ডী-নারায়ণ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নানা গান, এমনকী গঙ্গাস্তবও বাদ পড়েনি। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন নাটকে (বিল্বমঙ্গল, বিজয়া, ধ্রুব, বিষ্ণুপ্রিয়া ইত্যাদি) ব্যবহৃত ভক্তিমূলক গান। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েও কবি রচনা করেছেন অনবদ্য সংগীত, যা ভাব ও ভাষার মেলবন্ধনে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

অল্পবয়সেই তিনি চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯২৯ সালে অ্যালবার্ট হলে নজরুলের সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছিলেন, ''আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা একেকটি অতিমানুষে পরিণত হবে।'' তবে চলার পথ কখনও সম্পূর্ণ মসৃণ হয় না। একথা ভুললে চলবে না যে ভূয়সী প্রশংসার পাশাপাশি নজরুলকে তীব্র অপবাদেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯২৭ সালে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় নজরুলের লেখার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ (প্যারডি) প্রকাশিত হয়। 'মোহম্মদী', 'ইসলাম দর্শন' ও 'মোসলেম দর্পণ' পত্রিকাও নজরুলের লেখার কড়া সমালোচনা করতে থাকে। ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে হেয়চক্ষে দেখেন ও তাঁকে 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্মী বলে চিহ্নিত করেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষভাজন তো ছিলেনই; ফলে তাঁকে বারবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় ও তাঁর অনেক রচনা নিষিদ্ধ হিসাবে ঘোষিত হয়। একবার কারাবাসে থাকাকালীন তিনি অনশন শুরু করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে টেলিগ্রাম করে অনুরোধ করেন অনশন থেকে বিরত হতে, কারণ বাংলা সাহিত্যের তাঁর ওপর দাবি রয়েছে—''Give up hunger-strike, our literature claims you''।

অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ১৯৪২ সালে কাজী নজরুল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন; তাঁর অপূর্ব সৃজনশক্তির অকাল অবসান ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেতাল্লিশ বছর। এরপরও নিদারুণ কষ্টের মধ্যে সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কাটে। অবশেষে ১৯৭৬ সালে

বাংলাদেশে তাঁর দেহাবসান হয়।

কাজী নজরুল এক অসাধারণ, সাহসী কবি, যিনি ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ঘটিয়েছেন এক অভূতপূর্ব সেতুবন্ধন। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র মতো অগভীর তত্ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি অনায়াসে একটি ভিন্ন ধর্মের নির্যাস গ্রহণ করেছেন এবং রচনা করেছেন বহুসংখ্যক গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব-সমৃদ্ধ ভক্তিগীতি—তাও অজস্র বিরোধিতা ও অপবাদ অগ্রাহ্য করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে।

নজরুল-বিরচিত ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে তাঁর শ্যামাসংগীতই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এইচ এম ভি-র শ্যামাসংগীত সংকলন ক্যাসেট অ্যালবাম 'চয়নিকা'তে মোট তেষট্টিটি শ্যামাসংগীত রয়েছে। যার মধ্যে দশটি হল নজরুলগীতি। এতেই বোঝা যায় যে শ্যামাসংগীত-জগতে নজরুলের অবদান অপরিসীম। তাঁর জনপ্রিয় শ্যামাসংগীতের মধ্যে আছে—

''আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন—
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন,''

''বলরে জবা বল—
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামামায়ের চরণতল'',

''শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে'' ইত্যাদি। কাব্য ও ভাবগভীরতায় ঋদ্ধ নজরুলের লেখা শ্যামাসংগীতের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রতিটি গানের মধ্য দিয়েই কবির সাধকসত্তা কমবেশি প্রকাশিত। যেমন একটি গানে কবি বলছেন,

''মধু যে পায় শ্যামা পদে
কাজ কি রে তার বিষয়মদে?
যুক্ত যে মন যোগমায়াতে
ভাবনা কি তার রোগব্যাধিতে॥''

আবার কখনও বলছেন,

''আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা,
দেহ বিল্বদল,
মুক্তি পাব ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল॥
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম
মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম।''

কামনাবাসনা থাকলে যে ঈশ্বরলাভ হয় না, এই তত্ত্বই প্রতিভাত হচ্ছে এখানে। শুধু সংগীতসুধা নয়, ঈশ্বরচেতনার অমৃতরসমাধুরীও মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে তাঁর গানে।

বিভিন্ন সময় সাধকের মনে যেমন বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, তেমনি নজরুলের গানে মায়ের বিভিন্ন রূপের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। কখনও শ্যামা মা তাঁর কাছে লাজুক মেয়ে, কখনও ডাকাত-কালী, রক্তদন্তিকা, মহাকালী, রণচণ্ডী বা রুদ্রাণীরূপিণী।

''আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে
কেবলই সে লুকাতে চায়।
আলো-আঁধার পর্দা টেনে
(ভীরু) বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায়।''

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কবি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ না করেও কীভাবে জগন্মাতার রুদ্ররূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর স্বরূপ অনুধ্যান করেছেন ও অনায়াসে বলতে পেরেছেন,

''শ্মশানকালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়।
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায়॥''

হয়তো এই অতুলনীয় দৃষ্টিভঙ্গির নেপথ্যে রয়েছে নজরুলের বীরসত্তা। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন,

''সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।''

তদনুরূপ নজরুল বোধে বোধ করেছেন,

''তুই খড়্গের ভয় দেখাস মিছে,

ওমা মুক্তি আছে এরি পিছে (মাগো)
তোর হাসির বাঁশি শুনতে পাব
অসির আঘাত খেয়ে।"

রুদ্রাণীরূপা মায়ের শান্তরূপের বর্ণনাও ধরা পড়েছে কবির কলমে—

"দেখে যা রে রুদ্রাণী মা
হয়েছে আজ ভদ্রকালী।
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে
শ্মশান মাঝে শিবদুলালী।...
আজ অভয়ার ওষ্ঠে জাগে
শুভ্র করুণ শান্ত হাসি
আনন্দে তাই শিঙ্গা ফেলে
মহেন্দ্র ঐ বাজায় বাঁশি।"

সাধনপথের ইঙ্গিতও ধরা পড়ে তাঁর লেখায়—

"কুলকুণ্ডলিনীরূপে ওঠ মা জেগে চুপে চুপে
মা ছেলেতে যাব মা ভোলানাথের ঘুম ভাঙাতে॥"

আবার "বল রে জবা বল" গানে ভববন্ধন ও মুক্তি ('মায়াতরুর বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়লি লুটে/ মুক্তি পেলি উঠলি ফুটে আনন্দবিহ্বল'); সত্ত্ব, রজ, তম (কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসী জবা) ইত্যাদি তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা যেমন প্রকাশিত তেমন মায়ের পায়ে নিবেদিত জবার সৌভাগ্য অর্জন করার আকুতিও পরিস্ফুট—

"কবে উঠবে রেঙে—
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে উঠবে রেঙে,
কবে তোরই মতো রাঙবে রে মোর
মলিন চিত্তদল॥"

সাধকের শেষ কথা শরণাগতি। কবিও শেষপর্যন্ত সেখানেই উপনীত হয়েছেন—

"কি হবে জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে সাথে
বৃথা এ দীপ জন্মান্ধের হাতে
মা তুই যদি হস নির্ভর মোর
পথের ভয় আর রবে না মা।"

আর যে শরণাগত, সে তো দিবারাত্র মায়ের নামগুণগান করবেই, কবিও তাই করেছেন—

"আমার আর কোনও গুণ নেই মা
তোর ঐ নামের নামতা গোনা ছাড়া।
তুমি কোনও অঙ্ক শেখাওনি তো
তোমার অঙ্ক বিনা তারা॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ।" নিখাদ ভালবাসা ভগবানলাভের সহজতম উপায়। বাংলার অমূল্য সম্পদ আগমনী গানে এই ধ্রুবসত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই আঙ্গিকেও নজরুল অনেক গান রচনা করে বুঝিয়েছেন যে মেনকার স্নেহডোরে স্বয়ং জগজ্জননী হাসিমুখে ধরা দেন।

"মা, কে এলি তুই দনুজদলনী বেশে,
কন্যারূপে মা বলে ডাক হেসে,
তুই চিরকাল যে দুলালী মোর
মাতৃস্নেহে বন্দিনী॥"
"চুরি করে এনো গিরি আমার উমার দুই কুমারে।
দেখব তখন ভোলা মেয়ে
কেমন ভুলে থাকতে পারে।"
"ক্ষীর নবনী লয়ে থালায় কেঁদে ডাকি,
আয় উমা আয়!
যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন,
তাকে ছেড়ে মা কি বাঁচে॥"

মাতৃসংগীত ব্যতিরেকে অন্যান্য ভক্তিগীতিতেও নজরুলের ছিল অনায়াস বিচরণ, স্বল্প কয়েকটি আভাস দিলেই সেটি স্পষ্ট হবে। মহাদেবের রুদ্ররূপকে বন্দনা করে কবির প্রার্থনা—

"এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি, হে প্রলয়ঙ্কর,
রুদ্রভৈরব সৃষ্টিসংহার...
ধ্বংস করো সেই অশিব যজ্ঞ-অসুন্দর।"

আবার ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি—

"ওগো অন্তর্যামী ভক্তের শোনো নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায়

মোর তনু মন প্রাণ।"

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করে গেছেন, তনু-মন-প্রাণ এক করে ডাকলে "ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।" তাঁর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার্ঘ্য—

"পরম পুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার॥
জাগালে ভারত শ্মশানতীরে,
অশিব-নাশিনী মহাকালীরে,
মাতৃনামের অমৃতনীরে
বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি আনিলে
কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি
পূর্ণ তীর্থবারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গির্জায়,
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম-নিকেতনে
ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা জানিয়েই কবি তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, 'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ' গানে তিনি লিখলেন,

"তোমার কথামৃত কলির নববেদ
একাধারে রামায়ণ গীতা।
বিবেকানন্দ মাঝে লক্ষ্মণ অর্জুন
শক্তি করিলে পুনরুজ্জীবিতা।"

শুধু অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণেই নয়, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশেও ভক্তিগীতি উৎসর্গ করেছেন নজরুল।

"মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম।
নবদূর্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম।
সুরাসুর-কিন্নর-যোগী-মুনি-ঋষি-নর,
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥"

"শ্রীকৃষ্ণ রূপের কর ধ্যান অনুক্ষণ
হবে নিমেষে সংসার-কালীয়দমন।"
"বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়—
তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা,
কেউ বলে তায় শ্যামরায়।"
"কাঁদব না আর শচীদুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে,
তুমি গেছ চলে
তোমার প্রেম গিয়েছ রেখে।"

এযুগে যিনি সিংহবিক্রমে বেদান্তের বাণী প্রচার করেছেন সেই বিশ্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নজরুল লিখেছেন,

"জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী।
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম,
তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥
মদগর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি॥"

হিন্দু ভক্তিগীতি রচনার পাশাপাশি কাজী নজরুলের ইসলাম ভক্তিগীতি রচনার ধারাও অক্ষুণ্ণ ছিল। এ এক পরম বিস্ময়।

তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে সংগীতজগতে তাঁর অবদানের পুনর্মূল্যায়ন ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী, তা তাঁর জীবদ্দশায় হোক অথবা পরে। আজ তাঁকে আমরা এক প্রসিদ্ধ গীতিকার রূপে জানলেও ভক্তিগীতি রচয়িতা হিসাবে যে-মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল তার এক শতাংশও হয়তো তিনি জীবদ্দশায় পাননি। এই ঐতিহাসিক ত্রুটির সংশোধন কি আমরা আজও করব না?